

রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে
ড. এ কে আব্দুল মোমেন

বাংলাদেশ হবে
বিশ্বমানবতার
অগ্রদূত



আমি সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি এখানে এসে যে, আমাদের দেশে এতজন রক্তদাতা মানুষের সেবায় যুক্ত আছেন। তারা মানবজাতির গর্ব। তারা সত্যিকারভাবে আশরাফুল মাখলুকাত হওয়ার প্রচেষ্টায় আছেন। আমি খুবই আশুত। নিজেকে ধন্য মনে করছি, এরকম একটি অনুষ্ঠানে আমি আসতে পেরেছি।

সাম্প্রতিককালে বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় যুদ্ধ-সংঘাত লেগেই আছে। অজ্ঞতা ও অন্যের প্রতি সম্মানবোধের অভাবই এর মূল কারণ। পৃথিবীকে এই অস্থির অবস্থা থেকে মুক্ত করতে হলে পারস্পরিক সহিষ্ণুতা বাড়তে হবে। আমার বিশ্বাস, সারা বিশ্বে শান্তি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাংলাদেশই নেতৃত্ব দিতে পারবে।

কারণ ইউরোপীয় রেনেসাঁর প্রায় ছয়শ বছর আগে বাংলার কবি চণ্ডীদাস গেয়ে ওঠেন মানবতার জয়গান-সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই। এদেশের পরতে পরতে রয়েছে মানবিকতা। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন পরিচালিত স্বেচ্ছা রক্তদান কার্যক্রম এরই একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

সামর্থ্যহীন রোগীদের জন্যে বিনামূল্যে ৩৩,৪৬০ ইউনিট রক্ত প্রদান করার জন্যে কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনকে আমি ধন্যবাদ জানাই। আর স্বেচ্ছা রক্তদাতারা জাতিধর্মবর্ণ নির্বিশেষে রক্তদান করছেন ও অগণিত মানুষের জীবন বাঁচাতে ভূমিকা রাখছেন। এটাও শান্তি এবং সংস্কৃতির একটি আন্দোলন।

এই মহৎ ও প্রয়োজনীয় কাজটি শুধু সরকার বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে এককভাবে করা সম্ভব নয়। সেবার এ মানসিকতা সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে চাইলে সবাইকে কোয়ান্টামের মতো এগিয়ে আসতে হবে।

[৬ আগস্ট শত আজীবন রক্তদাতা সম্মাননা অনুষ্ঠানে একথা বলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের সাবেক স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত ড. এ কে আব্দুল মোমেন]



বিশেষ আলোচনায় গুরুজী সততা ও সুস্পষ্ট চেতনাজ্ঞান জীবনকে সার্থক করে

প্রশান্তির আকর হচ্ছে সততা। জীবনে সততার প্রয়োজন তাই সর্বাত্মক। আর সেইসাথে চাই সুস্পষ্ট চেতনাজ্ঞান। অর্থাৎ আমরা যে কল্যাণ চেতনায় বিশ্বাস স্থাপন করেছি এবং ধর্ম-সম্প্রদায়নির্বিশেষে মানুষকে উদ্ধৃত্ত করে সজ্ঞবদ্ধ সেবায় নিয়োজিত হয়েছি, সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ও পরিষ্কার ধারণা। এই সততা ও সুস্পষ্ট চেতনাজ্ঞানই পারে জীবনকে সার্থক ও পরিপূর্ণ করে তুলতে।

৯, ১০, ১১ সেপ্টেম্বর বান্দরবান লামার কোয়ান্টামে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ কার্যক্রমে একথা বলেন গুরুজী শহীদ আল বোখারী মহাজাতক। দেশজুড়ে ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন পর্যায়ে দায়িত্ব পালনরত আড়াই শতাধিক অর্গানাইজারের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় তিন দিনব্যাপী এ বার্ষিক কার্যক্রম।

গুরুজী বলেন, বর্তমান ভোগবাদী বিশ্বব্যবস্থা গোটা পৃথিবীজুড়ে, বিশেষত পাশ্চাত্যে দক্ষ ও চৌকস মানুষ তৈরিতে সচেষ্ট। সভ্যতার বিকাশে দক্ষতা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু শুধু দক্ষতা দিয়ে আজ পর্যন্ত কেউ প্রশান্তি অর্জন করতে পারে নি। যদি পারত তবে বিশ্বখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকরাই হতো এ-কালের সবচেয়ে প্রশান্তচিত্ত মানুষ। প্রশান্তির আসল উৎস সততা। সততাই দক্ষতাকে সেবায় রূপান্তরিত করে।

আর এই সততার ভিত্তি হলো চেতনাজ্ঞান। সুস্পষ্ট চেতনাজ্ঞানই আন্তরিক সততা সৃষ্টি করে। তাই আমরা যে আলোকিত চেতনায় বিশ্বাসী ও একত্রিত হয়েছি, সে চেতনার জ্ঞানে নিজেকে জ্ঞানী হতে হবে, যাতে ব্যক্তি ও চেতনার মাঝে কোনো ফাঁক থাকতে না পারে। চেতনা সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট না হলে চেতনাকে ভালবাসা যায় না। চেতনাকে ভালবাসতে না পারলে অন্তরে তৃপ্তি আসে না।

অন্যদিকে চেতনাশ্রেম অন্তরকে করে তৃপ্ত ও পরিচ্ছন্ন, যা একজন মানুষকে নিরন্তর কর্মোদ্যমে অনুপ্রাণিত করে। হতাশা-বিষণুতা-অস্থিরতাসহ যাবতীয় নেতিবাচকতা তার জীবন থেকে দূর হয়ে যায়। ফলে যে-কোনো পরিস্থিতি-প্রতিক্রিয়া-চ্যালেঞ্জের সামনে তখন তিনি থাকতে পারেন অবিচল। এবং স্বভাবতই এক ইতিবাচক অন্তঃঅনুরণন তার জীবনকে পরিচালিত করে সাফল্যের সরলপথে। জীবনের মতো তার মৃত্যুও হয় শান্তি ও পরিতৃপ্তির।

তিনি আরো বলেন, সততা বিকশিত হয় নৈতিকতা ও আত্মশুদ্ধির পথ ধরে। এজন্যেই প্রতিটি ধর্মে ও ঐশীশ্রেষ্টে আত্মশুদ্ধির ওপর এতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাই ব্যক্তিজীবনে সততা সৃষ্টির জন্যে প্রয়োজন স্ব স্ব ধর্মচার পালন ও নিয়মিত মেডিটেশন চর্চা। আর সততা অব্যাহত রাখার কার্যকর পথ হলো সজ্ঞ ও সেবা।



চেতনাজ্ঞানকে সমৃদ্ধ করতে নিয়মিত পড়ুন কোয়ান্টাম প্রকাশনা

সমাপনী আলোচনায় গুরুজী বলেন, কর্মতৃপ্ত সার্থক জীবনের জন্যে ধ্যানের সাথে জ্ঞানের যোগ ঘটতে হবে, যে জ্ঞান আমাদের চেতনাকে বুঝতে ও উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে। এজন্যে কোয়ান্টাম মেথড বইয়ের পাশাপাশি নিয়মিত কোয়ান্টাম প্রকাশনা পড়ুন ও কোয়ান্টাম ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

মাসিক মুক্ত আলোচনায়
অধ্যাপক ড. কায়কোবাদ

মানুষের ইতিবাচক
পরিবর্তনে ভূমিকা
রাখছে কোয়ান্টাম



যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসে একবার বিদ্যুৎ বিভ্রাট হয়েছিল। ওখানকার স্থানীয় অধিবাসীরা তখন সুযোগ বুঝে বিস্তর জিনিসপত্র চুরি করে নিয়ে যায়। সে তুলনায় আমাদের দেশের মানুষ এই ছোট দেশে একসাথে সবাইকে নিয়ে অনেক ভালো আছি।

পাশ্চাত্যে অনেক দেশে যখন বন্যা হয়, এত সম্পদ আর এত প্রকৃতির পরও ওদের বহু মানুষ মারা যায়। কিন্তু আমাদের দেশের মানুষ দুর্যোগে ঠিকই বেঁচে থাকার পথ করে নেয়। আমাদের উদ্যম ও জীবনীশক্তি অতুলনীয়। পৃথিবীর মাত্র এক-সহস্রাংশ ভূমির এই দেশে আমরা বাস করছি মোট বৈশ্বিক জনগোষ্ঠীর ২৪ সহস্রাংশ মানুষ! এত অল্প জায়গায় সীমিত সম্পদ নিয়ে এত মানুষ কীভাবে টিকে আছে, এটা তো একটা বিস্ময়। জাতিসংঘের উচিত অন্যান্য দেশগুলোকে বলা যে, এদের কাছ থেকে শেখো কীভাবে সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার করা যায়।

এর পাশাপাশি আমাদের উচিত উন্নয়ন-অনুকূল সংস্কৃতির বিকাশ ঘটানো। তাই জাতি হিসেবে আমাদের চরিত্রে ইতিবাচক পরিবর্তনও জরুরি। আমি মনে করি, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন এমনই একটি ব্যতিক্রমী প্রতিষ্ঠান, যা মানুষের চরিত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে।

[১৮ সেপ্টেম্বর মুক্ত আলোচনায় একথা বলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও বুয়েটের কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কায়কোবাদ]

কোয়ান্টাম মেথড

৪৩৪ তম কোর্স ৯ ঢাকা

১০, ১১, ১২ ও ১৩ নভেম্বর
(শুক্র, শনি, রবি ও সোমবার)

স্থান : ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স
বাংলাদেশ (আইডিইবি), কাকরাইল, ঢাকা

অধ্যাপক ড. খন্দকার সিদ্দিক-ই রব্বানী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োমেডিকেল ফিজিওলজি এন্ড টেকনোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা। প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বিশেষত চিকিৎসাসেবায় প্রয়োজনীয় নানা উদ্ভাবনের জন্যে তিনি দেশে-বিদেশে সুপরিচিত। বিজ্ঞান একাডেমি স্বর্ণপদক, ইব্রাহিম শ্মুতি স্বর্ণপদক ও ইউজিসি অ্যাওয়ার্ডসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন নিভৃতচারী এই বিজ্ঞানী। অধ্যাপক ড. রব্বানী ৭ আগস্ট কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন আয়োজিত মাসিক মুক্ত আলোচনায় প্রধান অতিথি হিসেবে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন। 'মানুষের জন্যে বিজ্ঞান' শীর্ষক বিষয়ে তার আলোচনার নির্বাচিত অংশ এখানে তুলে ধরা হলো।

আমি পিএইচডি করেছি ইংল্যান্ডে। তখন সেই ১৯৭৪ সালেই দেখেছি-প্রযুক্তিগতভাবে ওরা অত্যন্ত উন্নত দেশ। ওখানে সবাই কিছু না কিছু প্রযুক্তির সাথে জড়িত। এমনকি যিনি আর্টসের শিক্ষক তিনিও পারতপক্ষে গাড়ির ইঞ্জিনটা নিজেই সারিয়ে নেন। এক শিক্ষককে একদিন দেখি বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে বাড়ির ছাদটা নিজেই মেরামত করে তুললেন। এভাবে প্রযুক্তি ওখানে ছড়িয়ে আছে সর্বত্র। সবার জীবনেই।

ফলে কী হচ্ছে? কেউ একজন দেখলেন, এই কাজটা এই জিনিসের সাহায্যে সহজ হয়। তার মনে হলো, আচ্ছা, এটা তো আরো দশজনের কাজে লাগতে পারে। তিনি ছেড়ে দিলেন ওটা বাজারে। এভাবেই কিন্তু তাদের বাজারে বিভিন্ন পণ্য ছড়িয়েছে, তা দিয়ে ওদের জীবনমান উন্নত হয়েছে। বিজ্ঞানকে ওরা কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান-গবেষণাগারের ঘেরাটোপে বন্দি করে রাখে নি, দৈনন্দিন জীবনে মানুষের জন্যে ব্যবহারযোগ্য করে তুলেছে।

তখন থেকেই আমার এ চিন্তাটা হতো-আমার দেশের মানুষের জীবনের মান উন্নত করার জন্যেও প্রযুক্তি দরকার। কিন্তু সে প্রযুক্তি আমাদের কে দেবে? পাশ্চাত্যের লোকেরা এসে সেই প্রযুক্তি তৈরি করে দেবে না। করতে চাইলেও পারবে না, কারণ আমাদের আর ওদের প্রেক্ষাপট ভিন্ন, কাজের ধরন ভিন্ন। এটা করতে হবে আমাদেরই।

একটা কথা ছাত্রদের আমি প্রায়ই বলি। যেমন : গ্রামের দরিদ্র কোনো পরিবারের একটি ছেলে বা মেয়ে হয়তো মেধাবী। পরিবারের বাকিরা আধাপেটা খেয়ে না খেয়ে তাকে পড়ায়। তাদের আশা-সে একদিন পুরো পরিবারকে টেনে তুলবে। ঠিক তেমনি এদেশের মানুষও তো আমাদেরকে একইভাবে খাইয়েছে, পড়িয়েছে, বিদেশে উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ করে দিয়েছে।

তারপর আমরা কী করছি? আমরা বলছি-দেশে তো আমার কাজের সুযোগ নেই। এখানে আমাকে যথেষ্ট মূল্য দেয়া হচ্ছে না। বিদেশে যে অর্থ পেতাম, আরামে থাকতাম, এখানে তা পাচ্ছি না। কিন্তু একথা বলার নৈতিক যুক্তি আমাদের কতটা থাকে? আমরা লেখাপড়া করেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা লাভ করেছি, সেজন্যে যে অর্থ-সম্পদ দরকার-সেটা কোথেকে এসেছে? আমরা যে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করছি, এর ব্যয়ভার বহন করছে কে? সবটাই এসেছে এদেশের সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের কাছ থেকে।

তাই আমরা বিশেষত যারা প্রযুক্তির শিক্ষা পেয়েছি, তারা যদি দেশে ফিরে এই মানুষদের জন্যে কাজ না করি-তাহলে তা অত্যন্ত অনৈতিক কাজ হবে। এ বোধটা তখন থেকেই আমার মধ্যে একটা তাড়না সৃষ্টি করল। মনে হয়েছিল, মানুষ হিসেবে আমার জীবন একটাই। জীবনটা যেন অর্থবহ হয়। এ কারণে একটাই চিন্তা তাড়া করে ফিরত আমাকে-কেবে দেশে ফিরে যাব।

কমনওয়েলথ স্কলারশিপ নিয়ে ইংল্যান্ড গিয়েছিলাম। দেশে তখন কোনো চাকরিও ছিল না আমার। একরকম বুঁকি নিয়েই ফিরে এসেছিলাম। অনেকে একে পাগলামিও বলেছেন।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আগ্রহে একসময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলাম, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। প্রথমেই বুঝতে চাইলাম-কী ধরনের গবেষণা করলে কাজের সুফল মানুষের কাছে পৌঁছে দেয়া সম্ভব। কারণ সামর্থ্যের মধ্যে না হলে সবাই নিত্যজীবনে প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারবে না।

নিঃস্বার্থ তরুণ প্রজন্মই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে

অধ্যাপক ড. খন্দকার সিদ্দিক-ই রব্বানী



তখন মাইক্রোইলেক্ট্রনিক্সের বেশ চাহিদা। কিন্তু এ বিষয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে সেই আটাত্তর সালে যখন দেশে ফিরি, তখন এটা নিয়ে কাজ করার কোনো সুযোগ বা সম্ভাবনা এখানে ছিল না। তাই পথ খুঁজছিলাম, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ফিরে এসেছি কোন ক্ষেত্রে কাজ করলে তা পূরণ হবে। প্রযুক্তি-গবেষণায় এই দিকগুলো বিবেচনায় রাখা জরুরি বলে আমি মনে করি।

প্রথম পর্যায়ে শিক্ষকদের সাথে ও পরবর্তীকালে ছাত্রদের নিয়ে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় চিকিৎসা-উপকরণ তৈরি করি। যা এদেশে প্রথমবারের মতো ব্যবহার করে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা বেশ ভালো ফল পান। যেমন : ভাঙা হাড় জোড়া দিতে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্টিমুলেটর, স্নায়ু-কার্যকারিতা পরীক্ষার বিশেষায়িত যন্ত্র, স্বয়ংক্রিয় শ্বাসপ্রশ্বাস যন্ত্র, ডায়াবেটিস রোগীর চিকিৎসায় ডায়নামিক পেডোগ্রাফ, অতিরিক্ত হাত-পা ঘামা রোগীদের জন্যে প্রয়োজনীয় এন্টি-সোয়েট আয়োন্টোফোরেসিস, কৃত্রিম হাত ইত্যাদি। যেটুকু করতে পেরেছি সেজন্যে সৃষ্টিকর্তার কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এসব উদ্ভাবনগুলো বিভিন্ন সময় আন্তর্জাতিক সেমিনার-কনফারেন্সে

আমরা উপস্থাপন করেছি। উন্নত দেশগুলো সবাই বেশ আগ্রহ দেখিয়েছে। একবার এক কনফারেন্সে আমাদের উদ্ভাবিত একটি যন্ত্রের নমুনা দেখে একটি সুইস কোম্পানির ডিরেক্টর এসে বলল, আমরা তোমাদের এই যন্ত্রটিতে বিনিয়োগ করতে চাই, তবে তার আগে তোমাদের এটা পেটেন্ট করতে হবে। আমরা বললাম, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমরা পেটেন্ট করব না।

মালয়েশিয়ান একটি প্রতিষ্ঠানও আমাদের গবেষণায় অর্থায়ন করতে চেয়েছিল। তাদেরও দাবি ছিল-একটা যন্ত্র পেটেন্ট করতে হবে এবং তার স্বত্ব তাদের দিতে হবে। আমরা যথারীতি রাজি হই নি। আমরা মনে করি, আজকের পৃথিবীতে বৈষম্যের মূলে রয়েছে এই পেটেন্ট। যার ফলে কিছু লোক প্রযুক্তি কৃষিগত করে প্রচুর সম্পদের মালিক হয়ে গেছে, আর অধিকাংশই বঞ্চিত হচ্ছে। বিশ্বজুড়ে সাড়ে সাত বিলিয়ন মানুষের মধ্যে পাঁচ বিলিয়ন মানুষই আজ এভাবে বঞ্চিত। এজন্যে আমরা পেটেন্ট করতে চাই না। প্রযুক্তিকে আমরা ছড়িয়ে দিতে চাই মানবতার কল্যাণে।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে আমরা হয়তো লোকসান করছি। কিন্তু না, আমাদের লক্ষ্য বহুদূর। আমরা বিশ্বাস করি-আমরা পারব। আমাদের প্রচুর মেধাবী ছেলেমেয়ে রয়েছে। ওদের মধ্যে উদ্যম আছে, ওরা কাজ করতে চায়। এদের অনেকেই এসে বলে, স্যার আপনার সাথে কাজের সুযোগ পেলে বিদেশে যাব না। এখানেই গবেষণা-পিএইচডি করতে চাই।

প্রথমদিকে আমি বলতাম-পরিসা তো দিতে পারব না, চলবে কী করে? ওরা বলত, টিউশনি করে চলব। এজন্যে পরিবার থেকে অনেক কথাও শুনতে হয়েছে ওদের-তুমি একজন মেধাবী ছাত্র। সুযোগ থাকতেও কেন ইউরোপ-আমেরিকায় যাবে না? কিন্তু এমন অনেক ঝড়ঝঞ্ঝা পাড়ি দিয়েও তারা আজ দেশেই কাজ করছে, গবেষণায় ভালো করছে।

নিঃস্বার্থ এই তরুণ প্রজন্মের উদ্যম দেখে আমার একটা কথাই মনে হয়-আমরা যারা অগ্রজ, তারা যদি এদের পথ দেখাতে পারি, তবে এরাই একদিন নিজেদের স্বপ্ন ও কাজ দিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

[অনুলিখিত]

কর্মব্যস্ত সুখী জীবন ॥ যত ব্যস্ত তত সুস্থ

ফোন বেজে উঠল।

চুপিচুপি রিসিভ করল বাড়ির দুরন্ত ছেলেটি।
ওপাশের ভদ্রলোক বললেন-তোমার বাবা আছেন?
আমি তার বন্ধু। কথা বলতে চাই।

ফিসফিসিয়ে জবাব দিল ছেলেটি-

: বাবা ভীষণ ব্যস্ত।

: আচ্ছা, তাহলে মা-কে দাও।

: তিনিও খুব ব্যস্ত!

: ও! বড়রা আর কেউ আছেন যার সাথে কথা

বলতে পারি, জরুরি দরকার ছিল।

এবার আরো ফিসফিস শব্দে উত্তর দিল সে-
আছে, পুলিশ! এবার কিছুটা চিন্তায় পড়ে গেলেন
ভদ্রলোক। ব্যাপারখানা কী বোঝার জন্যে বললেন,
পুলিশকেই দাও।

ছোঁকরাও কম যায় না। তৎক্ষণাৎ জানিয়ে দিল-
পুলিশও ব্যস্ত। ফোন দেয়ার উপায় নেই।

ভদ্রলোকের অস্থিরতা তখন সত্যিই চরমে।
কৌতূহল দমিয়ে কোনোরকমে জানতে চাইলেন-
এছাড়া আর কেউ? ছেলেটির উত্তর : দমকলের
কর্মীরা আছে। কিন্তু তারাও যথারীতি ব্যস্ত।

এ-পর্যায়ে মোটামুটি আতঙ্কিত বাবার বন্ধুটি আর
রাগ সামলাতে পারলেন না। ক্ষেপে গিয়ে রীতিমতো
হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন-ইয়ার্কি হচ্ছে? সবাই ব্যস্ত!
তোমার বাবা-মা, পুলিশ, দমকল-কর্মী কেউই ফোন
ধরতে পারছে না? কী নিয়ে ওদের এত ব্যস্ততা?
করছোঁটা কী ওরা একটু শুন!

চাপাশ্বরে উত্তর এলো : 'প্লিজ আংকেল, দয়া
করে আন্তে বলুন। সবাই আমাকে খুঁজতে ব্যস্ত!'

ব্যস্ততার (!) এ-ও এক নমুনা বটে।

কিন্তু এমন দৃশ্টিভঙ্গি হুড়োহুড়ি আর স্ট্রেসপূর্ণ
ব্যস্ততা চাই না আমরা কেউই। তার বদলে চাই বরং
আনন্দময় ও পরিকল্পিত কর্মব্যস্ততা, যা শরীর-মন
দুয়ের জন্যেই স্বস্তিদায়ী ও স্বাস্থ্যকর। গবেষকরা
জানাচ্ছেন, ফলপ্রসূ ব্যস্ততা দেহ-মনকে রাখে সুস্থ ও
প্রাণোচ্ছল। দূর হয় মনের মেঘ। যাবতীয় আলস্য ও
নেতিচিন্তা-হতাশা-বিষণ্নতাকে বিদায় করে ঝেঁটিয়ে।
জীবন হয়ে ওঠে সুখী ও সার্থক।

কর্মব্যস্ত জীবন মানে সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু

প্রাচীন প্রবাদমতে, কাজ করতে করতে মানুষ
বড়জোর ক্লান্ত হয়, কিন্তু কাজ না করতে করতে সে
হয়ে পড়ে হতাশ ও বিষণ্ণ। হাল আমলের বিজ্ঞানীরা
বলছেন, হতাশা-বিষণ্নতার পাশাপাশি কর্মব্যস্ততাহীন
অলস মানুষের স্বাস্থ্যঝুঁকিও তুলনামূলক বেশি। আর
দৈনন্দিন রুটিন অনুসারে কর্মব্যস্ত সময় পার করেন
যারা, তারা অপেক্ষাকৃত সুস্থ জীবনযাপন করেন।
বাড়ে তাদের দীর্ঘায়ুর সম্ভাবনা।

এর পাশাপাশি যে-কোনো সমস্যা
মোকাবেলায় মনোদৈহিক দিক থেকে তারা হন
অধিকতর সক্ষম। গবেষণায় দেখা গেছে,
ক্রমাগত নানারকম কাজের মধ্য দিয়ে মানুষ
হয়ে ওঠে বাস্তববাদী। বুদ্ধিমত্তা হয়ে ওঠে
সুতীক্ষ্ণ। স্মৃতিশক্তি থাকে অটুট। ফলে
বয়সজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতায় আক্রান্ত হওয়ার
আশঙ্কা তাদের তুলনামূলক কম।

ব্যস্ততায় সুখিন্দ্রা ও প্রখর মস্তিষ্ক

আমেরিকায় পরিচালিত একটি সাম্প্রতিক
গবেষণা প্রতিবেদন অনুসারে, লক্ষ্যপানে ব্যস্ত
মানুষেরা সুখিন্দ্রা উপভোগ করেন। ঘুম থেকে তারা

ভোরে জাগতেও পারেন কোনো জড়তা ছাড়াই।
তাদের সামনে কারণটা স্পষ্ট থাকে যে, কেন তারা
ভোরে জাগবেন। সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনার কারণেই
তাদের জন্যে এটা বেশ সহজ।

যুক্তরাষ্ট্রের নর্থওয়েস্টার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের
স্নায়ুবিদদের মতে, কর্মব্যস্ত দিন কাটান যারা, তারা
অনিদ্রা ও ঘুম-সংক্রান্ত জটিলতায় ভোগেন কম। প্রিপ
সায়েন্স জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণাটি মূলত যাদের
ওপর চালানো হয় তাদের গড় বয়স ছিল ৭৯। তবে
গবেষণায় নেতৃত্বদানকারী প্রফেসর জেনসন অং বলেন,
যে-কোনো বয়সী মানুষের ক্ষেত্রেই এটা সত্য।

ব্যস্ত দিনের শেষে ঘুম ভালো হয় বলে তাদের
মনও থাকে সতেজ। দিনব্যাপী থাকতে পারেন
উদ্যমী ও ফ্রন্টিয়ার্স ইন নিউরোসায়েন্স জার্নালে
প্রকাশিত একটি রিপোর্টে গবেষক সারা ফেসিনি
বলেন, হরেক প্রকার কাজ আর চ্যালেঞ্জের পথ ধরে
মস্তিষ্কে ঘটে নিউরোপ্লাস্টিসিটি বা নিউরোনের
সংযোগায়ন। মস্তিষ্ক হয়ে ওঠে প্রখর। নিত্যনতুন
দক্ষতার বিকাশ ঘটে তখন সহজেই।

আলস্যে দুর্গতি, ব্যস্ততায় সুখ

কাজে ফুরসত পাই না বলে কখনো-সখনো আমরা
যে হতাশনে ভুগি না তা নয়; কিন্তু জেনে রাখুন,
আজকের গতিময় পৃথিবীতে ব্যস্ত মানুষের কদর
বেশি। আপনি ব্যস্ত, অতএব আপনি একজন
গুরুত্বপূর্ণ মানুষ। অন্যদিকে অলস মানুষের সময়
কাটে অনর্থক গালগল্প আর ঠুনকো বিনোদনে।
জীবনে যা কেবল দুর্গতিই বাড়ায়।

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিহেভিয়ারাল
সায়েন্সের প্রফেসর ও সাইকোলজিস্ট ক্রিস্টোফার
হ্যাসি। ২০১০-এ প্রকাশিত ফিজিওলজিক্যাল সায়েন্স
জার্নালে তিনি লিখেছেন, ব্যস্ততার সময়টাই আদতে
আমাদের সুখের সময়। সে বিচারে আলসে লোকের
অবস্থা বড় শোচনীয়। সুখী হওয়ার জন্যে তাদের
প্রতিও একটাই পরামর্শ-কর্মব্যস্ত থাকা।

কর্মব্যস্ত লোকেরা নিশ্চিতভাবেই আত্মবিশ্বাসী।
আরামবলয় ভেঙে বেরিয়ে আসতে পারেন তারা।
ফলে বাড়ে তাদের কর্মপরিধি। বিষয়টি মাথায়
রেখেই অভিভাবকদের প্রতি গবেষকদের পরামর্শ-
শৈশব থেকেই সন্তানদের গড়ে তুলুন কর্মব্যস্ত মানুষ
হিসেবে। আত্মবিশ্বাসদৃষ্ট একজন মানুষের মতোই সে
থাকবে হতাশা ও নেতিবাচকতা থেকে মুক্ত।



অবসরযাপন নয়, ব্যস্ত থাকুন সেবায় ও কল্যাণে

দৈনন্দিন কাজের ফাঁকে কিংবা পেশাগত জীবন শেষে
নিছক অলস অবসরযাপন নয়, বরং যতটা সম্ভব
কর্মব্যস্ত থাকুন। আনন্দ খুঁজে নিন সেবায়। ব্যস্ত
থাকুন সৃষ্টির কল্যাণে। মনোদৈহিকভাবে সুস্থ থাকার
জন্যেই এই কর্মসম্পৃক্ততা অতি জরুরি। ২০১৬-তে
যুক্তরাষ্ট্রের ওরেগন স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি
গবেষণায় বলা হয়েছে, অবসর গ্রহণের পর
একবছরের কর্মসম্পৃক্ততাও অকালমৃত্যুর হার কমাতে
পারে শতকরা ১০ ভাগ পর্যন্ত!

এ প্রসঙ্গে ইতালির ন্যাশনাল রিসার্চ কাউন্সিলের
নিউরোসায়েন্সিস্টরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন,
পঞ্চাশোর্ধ্ব ব্যক্তিদের মধ্যে যারা অবসরজীবন যাপন
করছেন, তাদের পেশির স্বাভাবিক শক্তি ও
কার্যক্ষমতা হারানোর ঝুঁকি তুলনামূলক বেশি। যা
পরবর্তীতে জটিল রোগের সম্ভাবনা বাড়ায়। হেলথ
ইকোনমিকস জার্নালে প্রকাশিত এ গবেষণাটি
পরিচালিত হয়েছে ইউরোপের ১২টি দেশে অবসর-
যাপনরত ৫০ ও তদুর্ধ্ব বয়সী মানুষের ওপর।

মানবকল্যাণে ব্যস্ততা অবসরজীবনে আপনাকে
রাখবে সুস্থ ও প্রাণবন্ত। রীতিমতো বৈজ্ঞানিক
গবেষণায় প্রমাণিত এটি। ৬৫ বছর বয়সে অবসরে
গেছেন এমন ১০০১ জন সুইডিশ নাগরিককে দুবছর
পর্যবেক্ষণ করেন কানাডার ক্যালগেরি বিশ্ববিদ্যালয়ের
সাইকোলজিস্ট প্রফেসর ইয়ানিক গ্রিপ। তিনি বলেন,
এদের মধ্যে যারা সপ্তাহে অন্তত একদিন সেবামূলক
কাজে ব্যস্ত ছিলেন, অন্যদের তুলনায় তাদের
বয়সজনিত স্মৃতিভ্রষ্টতায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি
কমেছে প্রায় আড়াই গুণ।

প্রফেসর গ্রিপের মতে, প্রবীণদের কর্মসম্পৃক্ততা
বিশেষত সেবাদর্মী কাজে ব্যস্ততা তাদের সুস্থতার
জন্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে শারীরিক, মানসিক
ও সামাজিকভাবে তারা উদ্যমী থাকেন। এতে মস্তিষ্ক
যেমন থাকে সক্রিয়, তেমনি চিন্তা ও বুদ্ধিবৃত্তিক
কর্মকাণ্ডেও তারা থাকেন সক্ষম। যুক্তরাষ্ট্রের সাউথ-
ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইকোলজিস্ট ড. জেন
প্রিন্স বলেন, কর্মব্যস্ততায় কমে তাদের ব্যথা ও
যন্ত্রণার অনুভূতি।

যত ব্যস্ত তত সুস্থ

যত আরাম তত ব্যারাম

জ্ঞানীরা বলেন, আলস্যই জীবনের প্রথম শত্রু। আর
কর্মব্যস্ততা মানে জীবনের উদযাপন। সুস্থতা, সুখ ও
সাফল্য ধরা দেয় কর্মপ্রাণ মানুষের ভাগ্যেই। উদ্যমী
হয়ে কাজে নেমে পড়লেই লেজ গুটিয়ে পালায়
যত ভয়, শঙ্কা আর বিষণ্ণতা। বহুমুখী কাজের
মধ্য দিয়ে তখন প্রকৃতই খুঁজে পাওয়া সম্ভব
হয় মানবজীবনের অর্থ ও সার্থকতা। কিন্তু
আরামে বাড়ে শত ব্যারাম।

তাই যথাসাধ্য ব্যস্ত থাকুন-
ইতিবাচক ফলপ্রসূ কাজে আর সজ্ঞাবদ্ধ
সেবায়। নিয়মিত মেডিটেশন, সুস্থ
জীবনাচার ও সুপরিকল্পিত দৈনন্দিন
রুটিন হোক আপনার কর্মব্যস্ত জীবনের
অনুপ্রেরণা। থাকুন সুস্থ। জীবন হোক সুখ
ও সার্থকতায় পূর্ণ।

ডা. আতাউর রহমান

তথ্যসূত্র : ডেইলি মেইল, ওয়াশিংটন পোস্ট

অকৃপণভাবে গ্রহণ করেছি

মো. মমিনুর রহমান



ছাত্র পড়ানো আমার কাজ। একজন শিক্ষক হিসেবে আমি জানি, ক্লাসরুম নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন। এখানে দেখলাম, এত বড় একটি ক্লাসরুম, কিন্তু কোনো কোলাহল নেই। গুরুজী কথা বলছেন, অকৃপণ হাতে

দিচ্ছেন, আমরাও অকৃপণভাবে গ্রহণ করছি।

আমার মনে হয়, গুরুজী এ কোর্সে যা বলেছেন, এসবের সাথে তার নিজস্ব চেতনার অনুরণন ঘটেছে বলেই তা আমাদের কাছে এতটা ভালো লেগেছে। কথাগুলো তাই বার বার শুনতে ইচ্ছে করে।

প্রাণায়াম ও দমচর্চার মাধ্যমে দেহ-মনের এনার্জি লেভেল ব্যালেন্স করতেও শিখলাম এই কোর্স থেকে। এছাড়াও সফট ড্রিংক্স ও ফাস্টফুডের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে বলা হয়েছে। আমার নিজস্ব গবেষণাতেও দেখেছি, এসব খাবার আমাদের দেহের জন্যে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

আমি নিজেও ক্যাডেট কলেজের ছাত্র ছিলাম। কিন্তু লামার শিশুদের ভিডিওচিত্রে ওদের প্যারেড নেপুণ্য দেখে আমি সত্যিই অভিভূত!

[সহযোগী অধ্যাপক, কেমিক্যাল বিভাগ, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। ৪৩২ ব্যাচ]

আমি পেরেছি, আমি পারব

শাহেদা সুলতানা পিংকি



দুই বছর আগে আমার মা কর্মসূত্রে জাপান যান। সবক্ষেত্রে আমি ছিলাম মায়ের ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীল। ফলে আমার জীবনে যেন বাড় নেমে আসে। এই কষ্ট থেকে আমি প্রায় সারাটা দিনই ঘুমিয়ে কাটাতেম।

ক্লাস না থাকলে ২০ ঘণ্টা, ক্লাস থাকলে কমপক্ষে ১২ ঘণ্টা। কিন্তু একজন মানুষ দিনে ২০ ঘণ্টাই ঘুমিয়ে কাটালে জীবনে আর কী থাকে!

কোর্সে এসে জানলাম, মাইন্ড সেট যেভাবে হবে মস্তিষ্কও সেভাবেই কাজ করবে। মেডিটেশনে তাই নিজেকে বললাম-আমি পারব। আসলেই পেরেছি। এই কদিন পরিমিত ঘুমিয়েই আমি ভালো আছি।

জাপানে যাওয়ার প্রস্তুতি হিসেবে আমাকে জাপানি ভাষা শিখতে হচ্ছে, যা আমার অনেক কঠিন মনে হচ্ছিল। এখন বিশ্বাস করছি, চেষ্টা করলে সবই সম্ভব। আগে লক্ষ্যস্থির করতে পারলেও পরিশ্রম করতাম না। কিন্তু এখন তা করতে পারছি। গুরুজীর একটা কথা আমাকে সবচেয়ে বেশি অনুপ্রেরণা দিয়েছে আর তা হলো-আমি যতই দোয়া চাই, নিজে চেষ্টা না করলে সফলতা সম্ভব নয়।

[শিক্ষার্থী, মাস্টার্স, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, আইইউবি। ৪৩২ ব্যাচ]

আবার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পেরেছি

জিয়া ইসলাম

এ বছরের শুরুতেই আমি বড় ধরনের একটি সড়ক দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই। ৩২ দিন কোমায় থাকার পর আমার জ্ঞান ফিরে আসে, দীর্ঘ চিকিৎসার পর ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। কিন্তু আগের মতো ছবি



তুলতে সবখানে যেতে পারছি না বলে একধরনের হতাশা বোধ করছিলাম-মনে হয় আমি আর পারব না। চার দিনের কোর্স শেষে মনে হচ্ছে, আমি পারব!

এখানে এসে আমি আমার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে পেরেছি। সবার জীবনেই একটা লক্ষ্য থাকা জরুরি এবং এ বিষয়গুলো নিয়ে এখানে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা দেয়া হচ্ছে। আমি মনে করি, মানুষের কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে যাচ্ছে কোয়ান্টাম।

বিশেষ ধন্যবাদ জানাই কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্যদের প্রতি। আমার অসুস্থতার সময় আপনারা সবাই আন্তরিক প্রার্থনা করেছেন।

[চিফ ফটো জার্নালিস্ট, দৈনিক প্রথম আলো। ৪৩২ ব্যাচ]

লাঠি ছাড়াই হাঁটতে পারছি

ফিরোজা বেগম



সাড়ে তিন বছর আগে আমি বাথরুমে পড়ে যাই। তারপর থেকে আমাকে বিছানায় শুয়েই কাটাতে হতো। চলাফেরা করতাম লাঠিতে ভর দিয়ে। মেডিটেশন করে এখন আমার বিশ্বাস অনেক বেড়েছে। আমি লাঠি

ছাড়াই হাঁটতে পারছি।

আগে টানা দু-তিন ঘণ্টা বসে থাকলেই আমার খুব অসুবিধা হতো। কিন্তু এ চার দিন বসে থাকতে কোনোরকম কষ্ট হয় নি। আমার ডায়াবেটিসও এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে।

[গৃহিণী। ৪৩২ ব্যাচ]

আমার পরিবর্তন দেখে পরিবারের সবাই খুশি

কাজী চন্দনা পারভীন

দেড় বছর ধরে প্রচণ্ড হতাশায় ভুগছিলাম। শারীরিক-মানসিক কষ্ট ও সবমিলিয়ে মনে হতো-রাত যেন না ফুরায়, দিন যেন আর না আসে। কিন্তু কোর্সের দ্বিতীয় দিন থেকে আমার অবস্থা বদলে যেতে শুরু করল।

এ কোর্সের অনেক কিছুই আমাদের জানা। কিন্তু জানা আর মানা এক নয়। কারণ কথা শোনানোর জন্যে সঠিক মানুষের দরকার, যা আমি আগে কোথাও পাই নি। এখন কোনোকিছু নিয়েই আমি আর হতাশ নই। আমার পরিবর্তন দেখে পরিবারের সবাই অনেক খুশি। আজ আমি সম্পূর্ণ ভিন্ন এক মানুষ।

[ব্যবসায়ী। ৪৩২ ব্যাচ]

আমি এখন রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে শিখেছি

অধ্যাপক আফরোজা সুলতানা



কোয়ান্টাম সম্পর্কে আমি ১০ বছর আগে জানলেও কোর্সে অংশ নেয়া হয়ে ওঠে নি। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, আরো আগে কোর্সটা করলে জীবনে আমি আরো অনেক কিছু করতে পারতাম! কারণ আমার রাগের

পরিমাণটা একটু বেশিই ছিল। আর এজন্যে সবচেয়ে বেশি কষ্ট পেত আমার প্রিয়জনরা।

কোর্সের আলোচনা শুনে বুঝতে পেরেছি, এই রাগের কারণে আমার ভালো গুণগুলোও চাপা পড়ে যাচ্ছিল। তাই বাসায় গিয়ে আর রাগারাগি করছি না। দেখছি পরিবারের সদস্যরাও এতে বেশ খুশি। তাদের আনন্দ দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। কোর্সের কথাগুলো আমার সন্তানের সাথেও শেয়ার করছি-আমি পারি, আমি করব। সে-ও এখন এটা প্রতিদিন চর্চা করছে।

[অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, ঢাকা কলেজ। ৪৩২ ব্যাচ]

অনন্য মানুষ হওয়ার প্রতিষ্ঠান কোয়ান্টাম

ফকরুল আলম খান কাঞ্চন



প্রাচীন এক সহকর্মীর উৎসাহে আমি কোর্সে অংশ নিয়েছি। তাকে কৃতজ্ঞতা জানাই। এখানে এসে মনে হয়েছে, অনন্য মানুষ হওয়ার প্রতিষ্ঠান এটি। কারণ কোয়ান্টামের দৃষ্টিভঙ্গি যারা চর্চা করছেন, তাদের

ইতিবাচক আচরণ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

এখন মনে হচ্ছে, কোয়ান্টামে অনেক দেরি করে এসেছি। আমার আরো আগে আসা প্রয়োজন ছিল। এখানে শিখলাম-আমি পারব, আমাকে পারতে হবে। আমার সন্তানদেরও আমি এ কোর্সে আনতে চাই।

[চিফ অব কন্সল্টেন্ট, এনটিভি। ৪৩২ ব্যাচ]

কোয়ান্টামের সার্বজনীনতা আমাকে শক্তি যুগিয়েছে

ড. নিরদ চন্দ্র সরকার

বিভেদ-ই পাপ;
অভেদ জ্ঞানই পুণ্য-
স্বামী বিবেকানন্দের
বাণী থেকে
শিখেছিলাম। আর এ
কোর্সে এসে গুরুজীর
সার্বজনীন ভাবনা
আমার এই শিক্ষাকে
শক্তি যুগিয়েছে।
এখানে এসে আমি যা
হারিয়েছি, তা হলো আমার রাগ-ক্রোধ।



কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে দেশের
পিছিয়ে পড়া শিশুদের নিয়ে বান্দরবান লামায়
যেভাবে শিক্ষিত করে গড়ে তোলা হচ্ছে, তা দেখে
আমার খুব ভালো লেগেছে।

[উপ-পরিচালক, মাশরুম উন্নয়ন ইনস্টিটিউট, সাভার, ঢাকা।
৪৩২ ব্যাচ]

নিজেকে একা মনে হচ্ছে না

রাহেলা রহমান



আমি যে-কোনো কিছু
যাচাই-বাছাই করে
গ্রহণ করতে পছন্দ
করি। তাই এ কোর্সে
আসার আগে আমি
কোয়ান্টামের
কার্যক্রমগুলো সম্পর্কে
জেনেছি এবং এর
নিয়ম-শৃঙ্খলা দেখে
অভিভূত হয়েছি।

কারণ জীবনের প্রথম শর্তই হলো নিয়মানুবর্তিতা।

দেশে আমাকে একা থাকতে হয়। কারণ আমার
তিন সন্তানই প্রবাসী। কিন্তু যখন গুরুজীর বইগুলো
পড়ি, নিজেকে আর একা মনে হয় না।

আমার পায়ে বেশ ব্যথা ছিল। নিরাময়ের
মেডিটেশন করে সেটা দূর হয়েছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের
সব শাখা থেকে জীবনের প্রয়োজনীয় শিক্ষাগুলো
কোয়ান্টামে পেলাম।

[গৃহিণী। ৪৩২ ব্যাচ]

আমার মনোযোগ বেড়েছে

রিয়া দাস



আগে আমার মন খুবই
অস্থির থাকত। সহজে
সিদ্ধান্ত নিতে পারতাম
না। মাথাব্যথার জন্যে
১০-১৫ মিনিটের বেশি
পড়তে কষ্ট হতো।
কোয়ান্টাম মেথড
কোর্সে অংশ নিয়ে ও
মেডিটেশন করে
আমার মন এখন

অনেক স্থির হয়েছে। মাথাব্যথা দূর হয়েছে।
পড়ালেখাতেও আমার মনোযোগ বেড়েছে।

[শিক্ষার্থী, এভিয়েশন টেকনোলজি ইনস্টিটিউট। ৪৩২ ব্যাচ]

কাল থেকেই আবার কাজ শুরু করব

নাসরিন জাহান

দেহ-মনের সম্পর্ক ও
পরাসম্ভবতা হলো
আমার লেখার বিষয়।
রাত জেগে লিখতে
গিয়ে একসময় মনে
হতো, আমারই সৃষ্ট
চরিত্রগুলো বাস্তবে
এসে আমাকে
আক্রমণ করছে।
এরপর রাতে লেখা



বন্ধ করলেও রাতের ঘুমটা আমার জীবন থেকে চলে
গেল। ২৫ বছর ধরে আমাকে ঘুমের ওষুধ খেতে
হচ্ছে। কিছুদিন ধরে ওষুধেও কাজ হচ্ছিল না।

আমি কখনো ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠতে
পারতাম না। কিন্তু কোর্সে এসে এই তিন দিন ভোর
পাঁচটায় উঠেছি। আর দুই-তিন ঘণ্টা হলেও রাতে
ঘুমিয়েছি। আগে তো সপ্তাহ ধরে ঘুম হতো না।

আরেকটা বিষয়, সময় দিচ্ছি না বলে আমার
কিছু বই প্রকাশিত হচ্ছে না। কোর্সের প্রতিটি গল্প ও
কথা আমাকে অনুপ্রাণিত করেছে। এখন আমার মনে
হচ্ছে, কাল থেকেই আমি আবার কাজে বেরিয়ে
পড়ব। আমার যে বইগুলো প্রকাশিত হওয়ার কথা তা
সম্পন্ন করতেই হবে। আলস্যকে আমি আর প্রশ্রয়
দেবো না।

[নন্দিত কথাসাহিত্যিক। ৪৩২ ব্যাচ]

কোয়ান্টামে আসা উচিত সপরিবারে

মো. নুরুল ইসলাম ওমর

দীর্ঘদিন মোটর
সাইকেল চালানোর
ফলে আমার
ব্যাকপেইনের সমস্যা
ছিল। ডাক্তার আমাকে
একটানা আধাঘণ্টা
কোথাও বসতে নিষেধ
করেছেন। অথচ কোর্সে
এসে ১০ ঘণ্টা বসে
থাকতে আমার কোনো



সমস্যা হয় নি। মস্তিষ্কে ব্যবহার করে কীভাবে সুস্থ
থাকা যায়, কোর্সে এসে তা জানলাম।

এর আগে আমি ইন্টারনেট থেকে মেডিটেশন
ডাউনলোড করে নিজে নিজে চর্চা চেষ্টা করেছি।
কিন্তু আমার বেশি ভালো লাগল কোয়ান্টাম মেথড
কোর্সে এসে মেডিটেশন করে।

আমি এখানে আমার স্ত্রীসহ এসেছি। মেডিটেশন
করে তার ঘুমের সমস্যা দূর হয়েছে। জীবনের প্রতিটি
ক্ষেত্রে পরিবারের সহযোগিতা সবচেয়ে বেশি
গুরুত্বপূর্ণ। তাই প্রত্যেকেরই সপরিবারে কোয়ান্টামে
আসা উচিত। সারাজীবন সুস্থ থাকার এবং প্রশান্তিতে
থাকার দিক-নির্দেশনা এখানে দেয়া হয়েছে।

[সংসদ সদস্য ও বিরোধীদলীয় ছইপ, বাংলাদেশ জাতীয়
সংসদ এবং কৃষি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সদস্য।
৪৩২ ব্যাচ]

পরিবার ও পেশাজীবনে সফল হতে সাহায্য করবে এ কোর্স

তাসনীর তামান্না

স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এমনকি জীবনে সবকিছু নিয়ে আমার টেনশন হতো।
কর্মজীবনে এসেও দিনকে দিন আমার টেনশন বেড়েই যাচ্ছে। যার
পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা দিল মাথাব্যথা। চিকিৎসকের পরামর্শে ২০০৪ সাল
থেকে আমাকে মাইগ্রেনের জন্যে ওষুধ খেতে হচ্ছে এবং ওষুধ সবসময় আমার
সাথেই রাখতে হয়।

মেডিটেশনের মাধ্যমে মাইগ্রেন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়, তা আমি আগে
জানতাম না। এখানে এসে আলোচনা শুনে ও নিরাময়ের মেডিটেশন করার পর
আমার মাথাব্যথা আর নেই। এই চার দিন আমি কোনো ওষুধও খাই নি। আমি
এখন টেনশনমুক্ত। আমার বিশ্বাস, কোয়ান্টাম মেথড কোর্স থেকে শেখা জ্ঞান
আমাকে পারিবারিক জীবন ও পেশাজীবনে সফল হতে সাহায্য করবে।

[এসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট, এবি ব্যাংক লিমিটেড। ৪৩২ ব্যাচ]



মানবিক ও নৈতিক বাংলাদেশের সূতিকাগার

এম আর মাহবুব



কোয়ান্টাম মেথড কোর্স থেকে আমি শারীরিক-মানসিক বিষয় ছাড়াও আরো
বহুবিধ উপকার পেয়েছি। ক্লাসে অংশ নেয়ার ১০-১২ দিন আগেও আমার হাঁটুতে
বেশ ব্যথা ছিল। কোর্সের প্রথমদিন হাঁটু ব্যথার কারণে আমার রিকশায় উঠতে
কষ্ট হচ্ছিল। অথচ এখন আমি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করছি। কারণ শতবার
সুস্থ দেহ প্রশান্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন উচ্চারণ করে আমি উপলব্ধি করেছি
সত্যিকারের প্রশান্তি। আমার হাঁটুতে আর কোনো ব্যথা নেই।

মেডিটেশন চর্চার দিক-নির্দেশনার সাথে সাথে আমাদের দেশ ও জাতির
গৌরবের কথাও তুলে ধরা হয়েছে কোয়ান্টামে, যা আমার খুব ভালো লেগেছে।
আমার বিশ্বাস, আমাদের ১৬ কোটি মানুষ কোয়ান্টামের ছায়াতলে আবদ্ধ হলে
মানবিক ও নৈতিক বাংলাদেশ গড়ে উঠবে।

[নির্বাহী পরিচালক, ভাষা আন্দোলন গবেষণা কেন্দ্র ও জাদুঘর। ৪৩১ ব্যাচ।]

গ্রাজুয়েটদের প্রশ্ন ? উত্তর দিচ্ছেন গুরুজী

প্রশ্ন : বর্তমানে মানসিক ও আর্থিক চাপে আমি নিজেকেই অনুভব করতে পারছি না। কিন্তু আমি সাহসী ও আত্মবিশ্বাসী হতে চাই। দায়িত্ব পালনকে উপভোগ করতে চাই। কীভাবে পারব?

উত্তর : আর্থিক চাপ কখন হয়? যখন আয়ের তুলনায় ব্যয় বেড়ে যায়। সাধারণভাবে আয় বাড়ার সাথে সাথে আমরা ব্যক্তিগত খরচের পরিমাণ অপ্রয়োজনে বাড়িয়ে ফেলি। এবং এটা করি শুধু ফুটানি করার জন্যে। অতএব নিজের ব্যয়টাকে যত পরিমিত রাখবেন তত আপনার আর্থিক চাপ কম হবে। মানসিক চাপও কমবে।

আর যাদের দায়িত্বভার আপনার ওপর, তাদেরকে আপনার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে খোলামেলা বলবেন-আমার এই সামর্থ্য আছে, আমি এতটুকু পারব। তাদের কাছে ফুটানির দরকার নেই। না পারলে বুঝিয়ে বলবেন যে, এটা আমার পক্ষে সম্ভব না। অর্থাৎ অতিরিক্ত চাপ নেয়ার কোনো প্রয়োজন নেই।

যেসব পরিবারে এখনো একাধিক ভাই-বোন একসাথে থাকেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, দায়িত্ব একজনের ওপর চাপিয়ে দিতে পারলে অন্যরা খুব খুশি থাকেন যে, আমাদের আর না করলেও চলবে। কিন্তু এটা ঠিক নয়, প্রত্যেককে যার যার দায়িত্ব নিতে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং আপনার সাধের মধ্যে দায়িত্ব নেন। তাহলে আপনি দায়িত্বকে উপভোগ করতে পারবেন।

এছাড়াও মানসিক চাপ কমানোর জন্যে নিয়মিত মেডিটেশন, কোয়ান্টাম ইয়োগা সঠিক খাদ্যাভ্যাস অনুসরণ করণ এবং সাদাকায়ন-আলোকায়নসহ ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রামগুলোতে নিয়মিত অংশ নিন।

প্রশ্ন : মাছ-মাংস খেতে আমার ভালো লাগে না। জোর করে খাওয়ালে খাই, তবে খুবই কম। ডিম খাই তবে নকলের ভয়ে আজকাল খেতে ইচ্ছে করে না। খুব অল্পে দুর্বল ও বিধ্বস্ত মনে হয় নিজেকে। ডাক্তার দেখিয়ে বিভিন্ন টেস্ট করানো হয়েছে। সব রিপোর্ট স্বাভাবিক। আমার নিক্রিয়াতা ও উদ্যমহীনতা কাটাতে কী করতে পারি?

উত্তর : আপনি নিয়মিত কোয়ান্টাম ব্যায়াম ও মেডিটেশন করুন। আর আপনার যেহেতু মাছ-মাংসে অরুচি, তাই এখন থেকে সয়াদুধ খাবেন। প্রোটিনের অভাব পূরণের জন্যে সয়াদুধ চমৎকার বিকল্প। সয়াবিন এবং বিন জাতীয় যত খাবার আছে খাবেন। বাদাম খাবেন।

আসলে মেয়ে হলেই লবঙ্গলতা হওয়ার প্রয়োজন নেই। আমাদের সমাজে ছোটবেলা থেকেই মেয়েরা আদর-আছাদ একটু বেশি পায়। এতে অনেকে নিজেদের মধ্যে একধরনের দুর্বলতা অনুভব করে। লামার কোয়ান্টামমে আমাদের মেয়ে বাচ্চাদের দেখবেন, ওদের গলার স্বর শুনবেন। তারা সুস্থ দেহ প্রাপ্ত মন কর্মব্যস্ত সুখী জীবন বলতে বলতে দিনে কয়েকবার পাহাড়ে ওঠে আর নামে। আর পরিশ্রম করলে এমনিতেই ক্ষুধা লাগে। লামায় খাবার এত সুখাদু লাগে কেন? একবার পাহাড়ে ঘুরে এলে মনে হয় সারি নয়, অমৃত খাচ্ছি।

তাই শারীরিক পরিশ্রমটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। পরিশ্রম হলে সব ধরনের খাবারেই রুচি হবে। এছাড়াও

শারীরিকভাবে সামর্থ্যবান হওয়ার জন্যে নিয়মিত ব্যায়াম করবেন।

প্রশ্ন : অল্পসময় শারীরিক পরিশ্রম করলেই খুব বেশি ক্লান্ত হয়ে পড়ি, হার্টবিট বেড়ে যায়। কী করলে অনেক বেশি পরিশ্রম করতে পারব?

উত্তর : আসলে এরকম হওয়া উচিত না। আপনি ৪০ দিন লামায় খেদমতায়ন করে আসুন। ভোর থেকে কাজ করবেন, সময়মতো খাওয়া-দাওয়া করবেন, নিয়মিত মেডিটেশন করবেন এবং ঘুমানোর সময় ঘুমাবেন। দেখবেন টানা ৪০ দিন এই নির্দিষ্ট নিয়মের মধ্যে থাকলে এসব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি নিজে অনুভব করবেন, আপনার সক্ষমতা কত বেড়েছে!

কারণ পরিশ্রম করারও একটা নিয়ম আছে। আমরা হঠাৎ করে একদিনে অনেক পরিশ্রম করতে যাই। ফলে দুর্বল হয়ে পড়ি। ক্লান্ত হয়ে হাঁপাতে থাকি এবং পরিশ্রমকে ভয় পেতে শুরু করি। পরিশ্রম বাড়তে হয় আসলে অল্প অল্প করে।

আমাদের যে তরুণরা মুক্তিযুদ্ধে বাঁপিয়ে পড়েছিল, তারা কজন তার আগে যুদ্ধ দেখেছে? কিন্তু দেখুন, পরিবেশ-পরিস্থিতির কারণে তারাই যোদ্ধা হয়েছেন, দেশের মুক্তির জন্যে যুদ্ধ করেছেন।

আসলে উপযুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে হয়। পরিবেশের সাথে মিশে যেতে হয়। জানতে হয় কীভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। তৈরি করাটাও কিন্তু দীর্ঘ প্রস্তুতির ব্যাপার। এটা আস্তে আস্তে করতে হয়, রাতারাতি নয়।

জীবনে ভালো হওয়ার

পথ সবসময়ই খোলা। যে-কেউ

যে-কোনো বয়সে যে-কোনো অবস্থা

থেকে জীবন শুরু করতে পারে।

কারণ কেউ যদি পরিবর্তনের জন্যে

আন্তরিক হয়, আল্লাহ যে-কোনো

অবস্থা থেকে তাকে ক্ষমা করতে

পারেন। তিনি তাকে সুন্দর

জীবনের অধিকারী করতে পারেন।

তবে এটা একাত্র চাওয়ার

ওপর নির্ভর করে

প্রশ্ন : সংসারী হয়েও আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্যে আমাদের নিয়মিত কী করা উচিত?

উত্তর : প্রথমত, নিজের এবং অন্যের কল্যাণচিন্তা। অর্থাৎ নিজেকে আগে শুদ্ধাচারী ও সদাচারী হতে হবে। তারপর আধ্যাত্মিকতা। এজন্যে নিয়মিত মেডিটেশন, ব্যায়াম ও পরিমিত আহারের পাশাপাশি সবকিছুতে সংযম অনুশীলন জরুরি। তাহলেই আপনি আধ্যাত্মিকতার পথে যেতে পারবেন।

আধ্যাত্মিকতার পথ খুব কঠিন ও কষ্টের পথ। কারণ নিজেকে সুশৃঙ্খল করা হচ্ছে সবচেয়ে কষ্টের। নিয়ম আমার সবসময় অন্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। কিন্তু না, আগে নিজেকে নিয়মের অনুসারী হতে হবে। এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন : আমার পরিবারে পাঁচ জন সদস্যই কোয়ান্টাম গ্রাজুয়েট। ছেলের একজন কলেজে দ্বিতীয় বর্ষে পড়ছে, আরেকজন দশম শ্রেণিতে। তাদের পড়াশোনায় মনোযোগ নেই, মোবাইলে আসক্ত। এখন আমি কী করতে পারি?

উত্তর : আপনি তাদের জোর করে কোর্স করিয়েছেন, কিন্তু তারা তো কোর্সের কিছুই গ্রহণ করে নি। কারণ গ্রহণ করার জন্যে যে মনটা দরকার, সেটা তাদের ভেতরে তৈরিই হয় নি। তাদের আসলে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এটাই প্রথম কাজ।

দ্বিতীয়ত, ওদের সঙ্গী পরিবর্তন করতে হবে। অর্থাৎ ইতিবাচক পরিমণ্ডলে তাদের যোগাযোগটা বাড়তে হবে। আর মা-বাবা হিসেবে আপনি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যা করতে পারেন, তা হলো প্রতিদিন দুবার কমন্ড সেন্টারে এনে তাদেরকে হিলিং করা এবং মমতা দিয়ে বোঝানো।

অর্থাৎ উদ্বুদ্ধ করবেন কিন্তু চাপ দেবেন না। আমরা মা-বাবারা অধিকাংশ সময় বোঝাতে গিয়ে বকাবকা শুরু করি। তারা বুঝলে তো আর বোঝানোর দরকার হতো না। তাই সময় নিয়ে ধৈর্য ধরে বোঝাতে হবে। কারণ অন্যের পাগল ছেড়ে দেয়া যায়, কিন্তু নিজের পাগল ছাড়া যায় না।

অতএব লেগে থাকতে হবে ধৈর্যের সাথে এবং উদ্বুদ্ধ করতে হবে। বগড়ায় যাওয়া যাবে না। এই বয়সটাই হচ্ছে খুব বিপজ্জনক। তাই তাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। যত বন্ধুত্ব করবেন তত আপনার ওপরে সন্তানের আস্থা বাড়বে। সে আপনার সাথে খোলামেলা হবে এবং তখনই আপনি সন্তানকে প্রভাবিত করতে পারবেন।

প্রশ্ন : সাত বছর বয়স থেকে অসংস্কে জড়িয়ে পড়ি এবং ভুল জীবনচা্রে অভ্যস্ত হয়ে যাই। বর্তমানে আমি শারীরিক ও মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন। আমি কি অনন্য মানুষ হতে পারব?

উত্তর : আসলে জীবনে ভালো হওয়ার পথ সবসময়ই খোলা। যে-কেউ যে-কোনো বয়সে যে-কোনো অবস্থা থেকে জীবন শুরু করতে পারে। কারণ কেউ যদি পরিবর্তনের জন্যে আন্তরিক হয়, আল্লাহ যে-কোনো অবস্থা থেকে তাকে ক্ষমা করতে পারেন। তিনি তাকে সুন্দর জীবনের অধিকারী করতে পারেন। তবে এটা একাত্র চাওয়ার ওপর নির্ভর করে।

আপনি যদি আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেন, অবশ্যই অনন্য মানুষ হতে পারবেন। কিন্তু এর জন্যে প্রয়োজন ধীরে ধীরে সুস্থ জীবনচা্রে অভ্যস্ত হওয়া। একটা নিয়মানুবর্তিতার মধ্যে নিজেকে নিয়ে আসতে হবে। আর যে ভুলগুলো আগে হয়েছে তার পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্যে তওবা করতে হবে।

এ মাসের অটোসাজেশন

আমার মন সুখ ও শক্তির আধার।

মনের সুখই আমার দেহের প্রতিটি

অসুখকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে।

জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত ব্লাড ক্যাম্প

জাতীয় শোক দিবস ও জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২ তম শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে দেশের স্বনামধন্য চারটি প্রতিষ্ঠানে কোয়ান্টাম স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত হয় দিনব্যাপী ব্লাড ক্যাম্প।



বাংলাদেশ ব্যাংক চত্বরে বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ এসোসিয়েশনের উদ্যোগে আয়োজিত ব্লাড ক্যাম্পে উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের গভর্নর ফজলে কবির। এতে বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে রক্তদান করেন।



ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত ক্যাম্পে রক্তদান করেন প্রতিষ্ঠানটির ১২৭ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। কার্যক্রমটি উদ্বোধন করেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান আরাক্ত খান।



বাংলাদেশ কমার্স ব্যাংক লিমিটেডের প্রধান কার্যালয়ে রক্তদান করেন প্রতিষ্ঠানটির ৪৬ জন কর্মকর্তা ও কর্মচারী। ক্যাম্পটির উদ্বোধন করেন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার রশিদ আহমেদ চৌধুরী।



যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরে আয়োজিত স্বৈচ্ছা রক্তদান কার্যক্রমে প্রধান অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলোয়ারুল করিম।

কোয়ান্টাম ফটোগ্যালারিতে ওস্তাদ আজিজুল ইসলামের একক বাঁশি সন্ধ্যা



১৭ সেপ্টেম্বর কোয়ান্টাম ফটোগ্যালারিতে আয়োজিত বাঁশি সন্ধ্যায় বাঁশি পরিবেশন করেন উপমহাদেশের বিশিষ্ট বংশীবাদক, একুশে পদকে ভূষিত ও কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ওস্তাদ ক্যাপ্টেন আজিজুল ইসলাম। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন মিডিয়া সেলের উদ্যোগে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানটি উপভোগ করেন ফাউন্ডেশনের বিভিন্ন শাখা সেলের দুই শতাধিক প্রো-মাস্টার সদস্য।

সফল শিক্ষার্থী ॥ আসিফ শাহরিয়ার

কোয়ান্টামে এসে জীবনের লক্ষ্য খুঁজে পেয়েছি

আমি ছিলাম সাধারণ মানের ছাত্র। এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষার ফল আশানুরূপ হয় নি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে শুধু একাউন্টিং-এ পড়ার সুযোগ পেলাম। কোনো উপায় না থাকায় অনিচ্ছা সত্ত্বেও ভর্তি হয়ে গেলাম।

বিশ্ববিদ্যালয়েও ফলাফল হচ্ছিল গড়পড়তা। অনার্স পড়াকালীন আমেরিকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে স্কলারশিপের জন্যে আবেদন করি। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় সেখানে সুযোগ পেলাম। ওখানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ছাত্রদের সাথে মিশে ভালো কিছু করার উদ্যম জাগে আমার। দেশে ফিরে আমি সমাজসেবামূলক কাজে উৎসাহী হয়ে উঠি।

এমন সময় এক বন্ধুর মাধ্যমে কোয়ান্টামের খোঁজ পেলাম। কোর্সে অংশ নিলাম। কোর্সে মনোহবি বা জীবনের লক্ষ্য নিয়ে গুরুজীর কথাগুলো আমাকে বেশ উদ্বুদ্ধ করল। আমি লক্ষ্য খুঁজতে শুরু করলাম। একসময় উপলব্ধি করলাম, শিক্ষকতা পেশার মাধ্যমে আমি মানুষের কল্যাণে কাজ করতে চাই। নিজে জ্ঞানী হতে চাই এবং মানুষের মাঝে এই জ্ঞানকে ছড়িয়ে দিতে চাই।

একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু

করলাম। তখন আমি কোয়ান্টিয়ার হিসেবে নিয়মিত কাজ করছিলাম ফাউন্ডেশনের রাজশাহী সেন্টারে। কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে গিয়ে অনুভব করলাম, আমার সীমাবদ্ধতার বৃত্তগুলো আমি একে একে ভাঙতে পারছি।

একপর্যায়ে দেশের বাইরে গিয়ে আইটি নিয়ে পড়ব বলে সিদ্ধান্ত নিলাম। এ-সময় নতুন করে আরেকটি বিষয় নিয়ে পড়াশোনা শুরু করার সাহস আমি পেয়েছি ফাউন্ডেশনে কাজ করতে গিয়ে। কারণ কোয়ান্টামে আমরা শিখি একজন মানুষ যে-কোনো পর্যায় থেকে জীবন শুরু করতে পারে।

জার্মানিতে সাউথ ওয়েস্টফেলিয়া ইউনিভার্সিটি অব অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস-এ স্কলারশিপ পেলাম। ফাউন্ডেশনে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করে যে অভ্যাস গড়ে উঠেছে, জার্মানিতে এসে তা থেকে অনেক উপকৃত হয়েছি। বিশেষ করে সময়মতো উপস্থিত হওয়া, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজ করা, প্রো-একটিভ থেকে সবার সাথে সদাচারণ ইত্যাদি।

এসব কারণে আমি যখন জার্মানিতে আমার পড়াশোনা শেষ করি, আমার প্রফেসর অনুরোধ করলেন এখানেই শিক্ষকতা করতে। শুধু আমাকে



নেয়ার জন্যেই তারা আলাদাভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি দিলেন।

এখন আমি এখানে প্রভাষক এবং মাস্টার্স প্রোগ্রামের কো-অর্ডিনেটর। পাশাপাশি ই-লার্নিং-এর ওপর আমার পিএইচডি'র কাজ এগিয়ে নিচ্ছি। কোয়ান্টাম মেথড কোর্স ও ফাউন্ডেশনে কোয়ান্টিয়ার হিসেবে কাজ করার অভিজ্ঞতা আমার জীবনদৃষ্টিকে সঠিক করেছে। মানুষের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ করার সাহস আমি এখানে থেকেই পেয়েছি।

[প্রভাষক, ইনফরমেশন ম্যানেজমেন্ট এবং মাস্টার্স প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, সাউথ ওয়েস্টফেলিয়া ইউনিভার্সিটি অফ অ্যাপ্লাইড সায়েন্সেস, যোস্ট, জার্মানি। ২৯৪ ব্যাচের গ্রাজুয়েট]

সরকারি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কোয়ান্টাম ইয়োগা



সাভারের বিপিএটিসি-তে অংশ নেন ৩৪ জন যুগ্মসচিব



বিসিএস একাডেমিতে ক্যাডারদের অংশগ্রহণে নিয়মিত অনুষ্ঠিত কোয়ান্টাম ইয়োগা



কুমিল্লায় অংশ নেন জেলা পুলিশ সুপার ও অতিরিক্ত পুলিশ সুপারসহ ৩০ জন

২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ লোক প্রশাসন কেন্দ্র সাভারে ৮৩ তম জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা কোর্সের আওতায় যোগের মাধ্যমে স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। এতে আলাদাভাবে ২৯ জন পুরুষ যুগ্ম সচিব ও পাঁচ জন মহিলা যুগ্ম সচিব এবং দুই জন পুরুষ জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা অংশ নেন।

২৫ ও ২৬ আগস্ট বিসিএস প্রশাসন একাডেমি শাহবাগে নিয়মিত যোগব্যায়াম কার্যক্রম কোয়ান্টাম ইয়োগা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে ১০২ ও ১০৩ তম আইন ও প্রশাসন কোর্স এবং ৬৫ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের মোট ১১টি ক্যাডারের ১১১ জন কর্মকর্তা অংশ নেন।

২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ইন-সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টার, কুমিল্লা পুলিশ লাইন্স-এ কোয়ান্টাম ইয়োগা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লার পুলিশ সুপার, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার, সিনিয়র সহকারী পুলিশ সুপারসহ এতে মোট ৩৪ জন পুলিশ কর্মকর্তা (৩০ জন অফিসার, চার জন স্টাফ সদস্য) অংশ নেন।

প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম স্টেপ ২

আপনি হোন সন্তানের প্রথম বন্ধু



প্রতিটি মা-বাবাই চান সুস্থ বুদ্ধিদীপ্ত আলোকিত সন্তান। এর জন্যে প্রয়োজন সন্তান প্রতিপালনের বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া অনুসরণ। প্যারেন্টিং-এর প্রস্তুতি শুরু হয় বিয়ের সময় থেকেই। ০-৫ বছর বয়সী শিশুর সার্বিক প্রতিপালনের কৌশল নিয়ে সাজানো হয়েছে প্যারেন্টিং স্টেপ ১ প্রোগ্রাম। ২০১৪ সালের মে মাস থেকে নিয়মিত অনুষ্ঠিত হচ্ছে এ কার্যক্রমটি।

এরই ধারাবাহিকতায় এবছর আগস্ট মাসে শুরু হয় প্যারেন্টিং স্টেপ ২। ৫-১৯ বছর বয়সী শিশুকে

একজন অনন্য মানুষ হিসেবে গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক দিক-নির্দেশনা নিয়ে সাজানো হয়েছে প্রোগ্রামটি। বর্তমান প্রেক্ষাপটে অভিভাবকদের সর্বাধিক দুশ্চিন্তা ৫-১৯ বছর বয়সী সন্তানদের নিয়ে। কারণ এই সময়ে শেখা মূল্যবোধ শিশুর জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি ও লক্ষ্য নির্ধারণ করে দেয়।

এ সময় মা-বাবার পাশাপাশি দাদা-দাদী, নানা-নানী, চাচা-ফুফু, মামা-খালাসহ সকল আত্মীয় এবং সর্বোপরি বন্ধুর ভূমিকা শিশুর জীবনদৃষ্টি গড়ে দেয়ার

ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই সন্তানকে অনন্য মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে অভিভাবক হিসেবে প্রথম সুযোগে অংশ নিন প্যারেন্টিং স্টেপ ২ প্রোগ্রামে।

কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের পরিচালক সমন্বয় মিসেস সুরাইয়া রহমানের পরিচালনায় এতে নিয়মিত আলোচনা করেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজের শিশু বিভাগের সাবেক সহযোগী অধ্যাপক এবং প্যারেন্টিং সিরিজ বইয়ের লেখক ডা. আহমদ মরতুজা চৌধুরী; স্কলারস্টিক স্কুলের সাবেক শিক্ষক ড. শাহিদা রহমান; ডা. মেহেদী আল মাসুদ, মাহবুবা হোসেইন প্রমুখ।

প্যারেন্টিং প্রোগ্রাম স্টেপ ২-তে রয়েছে :

- বয়ঃসন্ধিকালে সন্তানকে সঠিকভাবে গাইড করার ও প্রজন্মের দুরত্ব ঘুটিয়ে সন্তানের বন্ধু হওয়ার কৌশল।
- সন্তানের আচরণগত (রাগ, জেদ, অমনোযোগিতা ইত্যাদি) পরিবর্তনকে ইতিবাচক দিকে পরিচালিত করার দিক-নির্দেশনা।
- পুষ্টিবিজ্ঞানসম্মত খাদ্যাভ্যাস ও পারিবারিকভাবে তা অনুসরণের গুরুত্ব।
- টিভি, মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেটসহ যাবতীয় ভার্চুয়াল আসক্তি থেকে সন্তানকে মুক্ত রাখার কার্যকর উপায়।
- সুস্থ পারিবারিক আবহ তৈরির মাধ্যমে সন্তানের পরিপূর্ণ মানসিক বিকাশের সূত্র।
- সমমর্মী, দায়িত্বশীল, উদারমী ও চৌকস করে সন্তানকে গড়ে তোলার পদ্ধতি।

কোয়ান্টাম বুলেটিন : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৭ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহতাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ৫ টাকা**
Phone : 9341441, 8319377, 9355756 Mobile : 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ E-mail : bulletin@quantummethod.org.bd